আলো পথ
এমএলই বিষয়ক নিউজলেটার

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩
দ্বিতীয় সংখ্যা

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা

মা যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাতেই শিশু কথা বলতে শেখে। শিশু মায়ের মুখের কথা শুনে শুনেই ছড়া কাটে, নাচে, গান গায়, দৌড়ায়। যেন মুক্ত পৃথিবীর পুরোটাই তার একার। এভাবে বড় হতে হতে যখন তার বয়স চার কিংবা পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়, তখন সে প্রবেশ করে আরেকটি নতুন জগতে। এ সময়টা শিশুর বিদ্যা শিক্ষার সূচনাকাল। পাড়া, মহল্লা বা গ্রামের শিশুরা হৈ-চৈ করে শৈশবের শিক্ষা নিতে বাড়ির কাছাকাছি স্কুলে যায়। এই পর্যায়ে শিশুর শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শৈশবের এ শিক্ষা আমাদের দেশের সব শিশুর জন্য কি সুখকর হয়ে ওঠে?

২০১১ সালের জনগণনা জরিপ অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাক্ষরতার হার ৪৩.৯ যা জাতীয় হার হতে ৭.৯% নিচে। সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপটে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার রক্ষার ঘোষণায় (আর্টিকেল-২৮) বলা হয়েছে, সব শিশুর জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করতে হবে।

সেই সঙ্গে আর্টিকেল ৩০-এ বলা হয়েছে, আদিবাসী শিশুর ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার কথা। কিন্তু বিষয়টি এখনো অবহেলিত।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এমএলই বিষয়ক আলোচনায় সভাপ্রধান এসএম আশরাফুল ইসলামের মন্তব্য

এস এম আশরাফুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষানীতি-২০১০ এ সুস্পষ্টভাবে সকল শিশুর জন্য মাতৃভাষায় মৌলিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ২০১৩ সালের মধ্যেই ক্ষুদ্র ও নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার শিশুদের জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই) ছিল আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার। আমরা যদি ২০১৪ সালের মধ্যে আদিবাসী শিশুদের হাতে এমএলই উপকরণ পৌছাতে না পারি, তবে তা হবে আমাদের জন্য লজ্জাজনক।

আমি আশা করব, যেভাবেই হোক সীমিত পরিসরে হলেও অনতিবিলম্বে এমএলই উপকরণ প্রণয়নের কাজ শেষ করা হবে এবং ২০১৪ সালের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট শিশুদের হাতে এসব উপকরণ তুলে দেওয়া হবে।

তবে আশার কথা হলো, শিক্ষা নিয়ে কর্মরত কিছু কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা দেশের বিভিন্ন এলাকার আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ করে দিচ্ছে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সীমিত। উপকরণ উন্নয়ন ও বিদ্যালয় পরিচালনার মাধ্যমে মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাদানে মূল ভূমিকা পালনকারী এনজিওগুলোর মধ্যে সেভ দ্য চিলড্রেন, জাবারাং কল্যাণ সমিতি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্র্যাক অন্যতম। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সংগঠন মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের উদ্যোগ নিলেও এদের মধ্যে সমন্বয় ও পরস্পর তথ্য আদান-প্রদানের অভাব লক্ষণীয়। এনজিও পরিচালিত গুটিকয়েক বিদ্যালয় ছাড়া আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিশুরা যা পড়ছে তা কোনোভাবে তাদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রয়েছে পাঠদানকারী শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর ভাষাগত দূরত্ব।

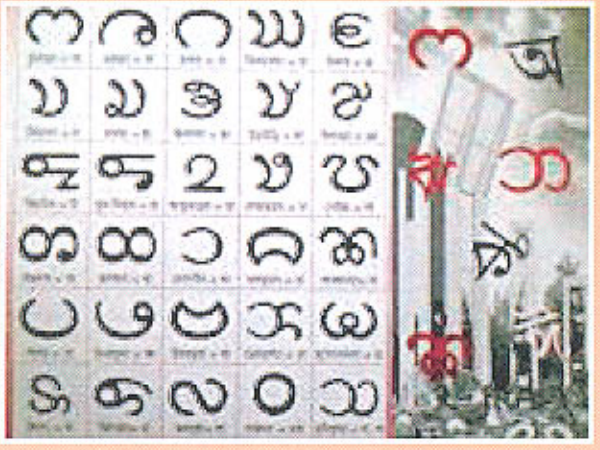

শুধু তাই নয়, দেশের প্রায় সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রমের পাঠ্যবই অনুসরণ করা হয় এবং এগুলোর ভাষা বাংলা। এসব পাঠ্যপুস্তক মূলত বাংলাভাষী বাঙালি শিশুর পাঠ, বোধগম্যতা এবং মানসিক বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এগুলো মোটেও আদিবাসী শিশুর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত নয়। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তকজনিত সমস্যার কারণে ঝরে পড়ে অনেক আদিবাসী শিক্ষার্থী। এক্ষেত্রে মৌলিক শিক্ষার সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আদিবাসী শিশুরা, যা ইউনিসেফের শিশু অধিকার রক্ষা ধারার স্পষ্ট বিরোধী। এক্ষেত্রে আদিবাসীদের জন্য পৃথক পাঠ্যক্রম তৈরি করা এবং নিজ ভাষার শিক্ষক নিয়োগ অত্যন্ত জরুরি। মূলধারার শিক্ষা শুরুর জন্য আদিবাসী শিশুর প্রয়োজনীয় মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের পরিবেশ তৈরি করা এবং বিদ্যালয়ের নিয়মনীতি অনুসরণে উৎসাহ দানের মাধ্যমে পরবর্তী শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলাই হচ্ছে আদিবাসী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। ৫+ বছর বয়সী আদিবাসী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। তাই আদিবাসী শিশুর জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিক লক্ষ্য করে ৫+ বছরের শিশুদের আনুষ্ঠানিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে প্রতিবেশী ভারতসহ বিভিন্ন দেশে আদিবাসীদের শিক্ষা উন্নয়নে গৃহীত সরকারি উদ্যোগ ও ভূমিকা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ভারতের ত্রিপুরা এবং মিজোরামে মিজো এবং ত্রিপুরায় (ককবরক) ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনাসহ শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে অনেক আগেই। থাইল্যান্ডে আদিবাসী শিশুর জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক তৈরি ও মৌলিক শিক্ষাদানে সাফল্য এসেছে। এমনকি নাইজেরিয়া এবং ফিলিপাইনের শত শত আদিবাসী গোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়ন ঘটিয়েছে সরকার।

বাংলাদেশ সরকার আদিবাসীদের অধিকার, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, বৈষম্য কমানো এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে অনেক চুক্তি বা সনদে স্বাক্ষর করেছে। এসব চুক্তি বা সনদকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের প্রায় একযুগ পর পার্বত্য শান্তিচুক্তি অনুযায়ী সরকার মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা (ধারা ৩৩-খ/২) প্রদানের জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার একটি কমিটি গঠন করে। ২০১৪ সালে ৬টি আদিবাসী ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সাঁওতাল ভাষার হরফ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেওয়ায় সরকার আপাতত ৫টি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার ওপর জোর দেওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত শুধু বাংলা ভাষার ওপরই জোর দেওয়া হচ্ছে। সব আনুষ্ঠানিক স্কুলে একসঙ্গে যোগাযোগ ও সাক্ষরতার ভাষা হিসেবে বাংলাকে ব্যবহার করা হয়। এখনও আদিবাসীদের ভাষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্যবহৃত হয় না। এছাড়া আদিবাসী ভাষার শিক্ষক সংখ্যা কম হওয়ায় তাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার এবং ঝরে পড়ার হার বেশি। ২০০৯ সালে তিন পার্বত্য জেলায় ইউএনডিপি পরিচালিত আর্থ-সামাজিক জরিপে দেখা যায়, সেখানে ৬৫% শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর ঝরে পড়ে ১৯ শতাংশ। উক্ত জরিপে ভাষা সমস্যাকে ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী আদিবাসীদের শিক্ষার এ দুরাবস্থার অবসান ঘটাতে হলে সবার আগে প্রয়োজন আদিবাসী শিক্ষার অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করা। এরপর দরকার সেগুলো দূরীকরণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া। তাহলেই মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশু শিক্ষার প্রসার ঘটবে, আর এ উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে।

প্রশান্ত কুমার রায়

এমএলই ম্যাপিং স্টাডি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্থা 'মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা' কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গণসাক্ষরতা অভিযান ও সহযোগী সংস্থাসমূহ সম্মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত 'মাল্টি-লিংগুয়াল এডুকেশন (এমএলই) ফোরাম' ২০১১ সালে 'বাংলাদেশে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম' শীর্ষক একটি ম্যাপিং স্টাডি পরিচালনা করে। ইউনেস্কো-ঢাকার আর্থিক সহায়তায় এমএলই ফোরামের পক্ষে 'গবেষণা ও উন্নয়ন কালেক্টিভ' ম্যাপিং স্টাডি পরিচালনা করে। এই জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হলো:

এমএলই কার্যক্রমভূক্ত এলাকা

বাংলাদেশে ৭৮ টি আদিবাসী ও অ-আদিবাসী জাতিসত্তার জন্য এমএলই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১০২টি সংস্থা ২৯টি জেলার ১১২টি উপজেলায় আদিবাসী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই সকল কার্যক্রমের আওতায় ১০ ভাগ শিশু প্রাক-প্রাথমিক ও ৯০ ভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলে-মেয়ের সংখ্যা সমান হলেও প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে মেয়েদের হার ৫৬ ভাগ আর ছেলেদের হার ৪৪ ভাগ দেখা যায়।

শিক্ষক/সহায়ক

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক মিলে ৩৪৯৬টি কেন্দ্রে নিয়োজিত শিক্ষক/সহায়কের ৯৩ ভাগ আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

শিখন-শেখানোর ভাষা

এমএলই কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের শিক্ষা কর্মসূচির ধরনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মাত্র ২৯ ভাগ সংস্থা সংশ্লিষ্ট মাতৃভাষায় উন্নীত শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবই ও উপকরণ ব্যবহারসহ শিখন শেখানোর মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা ব্যবহার করছে। বাকী ৭১ ভাগ সংস্থা মাতৃভাষা শুধু শিখন-শেখানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে।

এমএলই উপকরণ

আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় উন্নীত মোট ১৮৫ ধরনের উপকরণ ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য উপকরণসমূহ হচ্ছে বর্ণমালার চার্ট, গণণা চার্ট, প্রাইমার/বই, পোস্টার, ছবি, ক্লিপ চার্ট, কর্ণার সাজানোর উপকরণ, বিভিন্ন মডেল, ব্লক, ফ্লিপ চার্ট, পাজল ইত্যাদি। সমতলের আদিবাসীদের চেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের ভাষায় উন্নীত বই ও উপকরণের সংখ্যা বেশি। শুধু চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় ৬১ ধরনের বই আছে। ৮টি আদিবাসী ভাষায় বর্ণমালা হিসেবে রোমান এবং ৫৮টি আদিবাসী ভাষায় বর্ণমালা হিসেবে বাংলা-কে গ্রহণ করে উপকরণ উন্নয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম

ব্র্যাক, সেভ দ্য চিলড্রেন, সিল বাংলাদেশ নিজস্ব কার্যক্রমের জন্য প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করেছে। এ সব শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনসিটিবি নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন সূচক বিবেচনা করা হয়। কিছু সংস্থা যোগ্যতা অর্জন সূচক বিবেচনা ছাড়াই শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন শিক্ষাক্রম ব্যবহার করে। এখনও সবার জন্য ব্যবহার সহায়ক কোনো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়নি। তবে অনেক ছোট ছোট সংস্থা ব্র্যাক, প্ল্যান বাংলাদেশ উন্নীত শিক্ষাক্রম ব্যবহার করে বলে জানা যায়। অনেক সংস্থার নিজস্ব লিখিত শিক্ষাক্রম নেই।

ব্রিজিং প্ল্যান

আদিবাসী শিশুরা মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করে পর্যায়ক্রমে মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হবে- এমন একটি ব্রিজিং প্ল্যান উন্নয়ন করে কিছু সংস্থা এমএলই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এক্ষেত্রে প্রথম ভাষা (মাতৃভাষা) দ্বিতীয় ভাষা (বাংলা) এবং তৃতীয় ভাষা (ইংরেজি বা অন্যান্য) ব্যবহার করা হয়। তবে ব্রিজিং প্ল্যান ব্যবহারকারী সংস্থার সংখ্যা খুবই কম।

এমএলই কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ, উপকরণ উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ তত্ত্বাবধান মূল্যায়ন, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রভৃতি কার্যক্রমে আদিবাসী কর্মীর সংখ্যা ৭৬ ভাগ। বিশেষ করে তত্ত্বাবধান কাজে সর্বোচ্চ ৮৩ ভাগ আদিবাসী কর্মী নিয়োজিত আছে।

সুপারিশমালা

এমএলই ম্যাপিং স্টাডি'র পক্ষ থেকে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

- শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে সরকারিভাবে এমএলই কার্যক্রম চালু করা;
- বেসরকারি যে সকল সংস্থা এমএলই কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাদের উচিত কার্যক্রমের সফল দিকসমূহ তুলে ধরে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এডভোকেসি করা ও লবিং জোরদার রাখা;
- এমএলই বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা, যোগ্যতাভিত্তিক একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম, ব্রিজিং প্ল্যান, পরিবীক্ষণ কৌশল উন্নয়নসহ একই ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে কার্যক্রমকে গতিশীল করা;
- এমএলই কার্যক্রমে নিয়োজিত শিক্ষক/সহায়কসহ সকল কর্মীদের জন্য মানসম্মত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

মোশাররফ হোসেন

এক নজরে এমএলই বিষয়ক উদ্যোগ

আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ২০০৭ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান সুনির্দিষ্ট কর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করে। জাতীয় পর্যায়ে সভা সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বিস্তারধর্মী এসব কর্ম উদ্যোগ বাস্তবায়নে গণসাক্ষরতা অভিযান ও পার্টনার এনজিওদের সঙ্গে একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে। নেটওয়ার্কের প্রচেষ্টায় এবং সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গীকার সন্নিবেশিত হয়।

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার উদ্যোগকে তরান্বিত করতে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট পার্টনার এনজিও এবং আদিবাসী গ্রুপ ও ফোরামের অংশগ্রহণে ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০-এ একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে সকলকে নিয়ে একটি বহুভাষিক শিক্ষা ফোরাম (এমএলই ফোরাম) গঠনের প্রস্তাবনা গৃহীত হয়।

উপর্যুক্ত প্রস্তাবনা অনুসারে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক ও মানবাধিকার কমিশনের সদস্য সেলিনা হোসেনকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় এমএলই ফোরাম। গণসাক্ষরতা অভিযান এ ফোরামের সদস্য সচিব হিসেবেও মনোনীত হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় অক্টোবর ২০১০ এ এনসিটিবির চেয়ারম্যান জনাব মো: মোস্তফা কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এমএলই ফোরাম থেকে একটি ব্রিজিং প্ল্যান উত্থাপিত হয়। উপর্যুক্ত সভায় এনসিটিবি-এর চেয়ারম্যান এমএলই সংক্রান্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস ব্যক্ত করেন এবং এ বিষয়ে এমএলই ফোরামের সহায়তা প্রত্যাশা করেন।

একই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক সভায়ও মহাপরিচালক মহোদয় এমএলই ফোরামের প্রস্তাবনা গ্রহণ করেন। এরই আলোকে আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এমএলই উপকরণ প্রণয়নের কাজ শুরু করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবিকে অনুরোধ জানান। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমএলই ফোরাম কর্তৃক ৮ অক্টোবর ২০১১ তারিখে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা নিয়ে কর্মরত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি, বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রতিনিধি ও ভাষা কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি আকারে প্রেরণের জন্য এমএলই বাস্তবায়ন বিষয়ক সুপারিশমালা তৈরি করা হয়।

উপর্যুক্ত সুপারিশমালা নিয়ে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে এমএলই ফোরামের অংশগ্রহণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব আঃ আউয়াল মজুমদার মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এমএলই উপকরণ প্রণয়নের লক্ষ্যে ৫/৬টি আদিবাসী ভাষা নির্বাচন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য এমএলই ফোরামকে অনুরোধ জানানো হয়।

সে অনুসারে ৪ এপ্রিল ২০১২ তারিখে একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব মহোদয় উপর্যুক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় বিভিন্ন আদিবাসী

জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা বিবেচনা করে সর্বসম্মতভাবে ৩টি পর্যায়ে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে এমএলই কার্যক্রম বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রণয়নের জন্য অতিরিক্ত সচিব জনাব এসএম আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি মনোনীত করে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে এমএলই ফোরামের প্রতিনিধিরাও অন্তর্ভুক্ত হয়।

৫ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে অতিরিক্ত সচিব জনাব এসএম আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ ও এমএলই ফোরাম-এর অংশগ্রহণে আয়োজিত এক সভায় ৬টি ভাষায় মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই মর্মে ৬ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে "আমাদের সময়"সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

পরবর্তী সময়ে উপর্যুক্ত কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইউনেস্কো-এর অর্থানুকূল্যে এমএলই ফোরাম কর্তৃক আরডিসিই-এর সহায়তায় বাংলাদেশে এমএলই ম্যাপিং স্টাডি সম্পাদন করা হয়। এই স্টাডিতে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে এমএলই ফোরাম-গণসাক্ষরতা অভিযান, এনসিআইপি ও সেভ দ্য চিলড্রেন-এর উদ্যোগে সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত হয় জাতীয় সেমিনার। সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোতাহার হোসেনসহ নীতি নির্ধারকরা ২০১৪ সালের মধ্যেই মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা উপকরণ আদিবাসী শিশুদের হাতে তুলে দেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এসব প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনিবার্যকারণবশত ৬টি ভাষার পরিবর্তে আপাতত ৫টি ভাষায় এমএলই উপকরণ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং অনতিবিলম্বে উপর্যুক্ত ৫টি ভাষাভাষী লেখকদের নিয়ে কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই মর্মে ১৪ নভেম্বর মন্ত্রণালয়ের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এমএলই ফোরাম কর্তৃক ১৮ নভেম্বর তারিখে ৫টি ভাষা কমিটি গঠন করতে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় হিল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেন। এ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯ নভেম্বর অতিরিক্ত সচিব জনাব এসএম আশরাফুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এমএলই ফোরাম কর্তৃক ৫টি ভাষায় এমএলই উপকরণ প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ৫টি কমিটির নাম পেশ করা হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সংশ্লিষ্ট হিল ডিস্ট্রিক্ট এর মতামতের সঙ্গে সমন্বয় করে অনতিবিলম্বে লেখক তালিকা চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এমএলই ফোরাম আশা করে ২০১৪ সালের সূচনা লগ্নেই আদিবাসী শিশুদের হাতে অন্তত প্রি-প্রাইমারি লেভেলে এমএলই উপকরণ তুলে দেওয়া সম্ভব হবে এবং তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের অধিকার সু-প্রতিষ্ঠিত হবে।

তপন কুমার দাশ

মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারে

কালচারাল এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি

কালচারাল এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (সিডিএস) গারো সংস্কৃতি ও ভাষা উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০০০ সালের ২৭ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সিডিএস গারো আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে গারো শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করছে। বর্তমানে সংস্থাটি গারো, কোচ ও হাজং আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছে।

সকল শ্রেণির গারো আদিবাসীদের মতামত গ্রহণ করে কর্মসূচি নির্ধারণের লক্ষ্যে সিডিএস 'মান্দি কৃষ্টিসংস্কৃতি ও উন্নয়নের উপায় অনুসন্ধান' শিরোনামে বালিজুরী গ্রামে ২২-২৪ মার্চ ২০০২ সালে একটি কর্মশালা আয়োজন করে। শেরপুর ও জামালপুর জেলার শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতী, শেরপুর সদর ও বকশীগঞ্জ উপজেলার ৫০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

মাতৃভাষায় শিক্ষার ধারণা সম্পর্কে এলাকার সাধারণ আদিবাসীদের অবহিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভের পাশাপাশি সাধারণ আদিবাসীদের মধ্যে আগ্রহও সৃষ্টি হতে থাকে। একই সঙ্গে গারো ভাষার স্বরূপ, সাহিত্য, ব্যবহার পরিধি, শিক্ষার মাধ্যম, ভাষার গতিধারা ইত্যাদি বিষয় জানা ও তথ্য সংগ্রহের প্রয়াস চলে। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ, পরামর্শ গ্রহণ, কর্মকৌশল নির্ধারণ ইত্যাদির মাধ্যমে মূল লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। উপকরণ তৈরিসহ মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ চলতে থাকে। এক্ষেত্রে Save the Children-UK এবং বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান Summer Institute of Linguistics Bangladesh (SIL)-এর প্রাথমিক পর্যায়ের সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য।

২০০৯ সাল থেকে নিজস্ব শিক্ষা উপকরণ তৈরির কাজ শুরু হয়। প্রথম দিকে NANGRIMA Garo–Language Committee প্রকাশিত প্রাথমিক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো হতো। প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের পাঠ্যপুস্তক তৈরির লক্ষ্যে সিডিএস ২০১০ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ৪টি কর্মশালার (প্রতিটি ৫দিনের এবং ৪০জন করে অংশগ্রহণকারী) আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে ২০১২-এর জুনে ABACHENGANI KI·TAP ও BISARANGNI GOLPO ARO GOSERONG নামে দুটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। কর্মশালা, বই দুটি প্রকাশ ও প্রকাশনা উৎসব আয়োজন প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বই দুটি বর্তমানে বিভিন্ন গারো অধ্যুষিত এলাকার ২৪টি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গারো শিশুদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

গারো ভাষায় সাহিত্য রচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা সিডিএস'এর একটি চলমান কার্যক্রম। এছাড়া উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো: প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা, গারো শিশুদের জন্যে মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, বিস্তার ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ইত্যাদি। এমএলই বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোনো প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা না থাকলেও গারো ভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে অভিজ্ঞ এবং স্বপ্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী রয়েছেন, যারা প্রাথমিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

বাঁধন আরেং

মুক্তিযোদ্ধা কার্ত্তিক পাত্র

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, আলীনগর চা বাগানের বাসিন্দা কার্ত্তিক পাত্র। ১৯৭১ সালে বয়স ছিল ২৪ বছর। আলীনগর চা বাগানে সে সময় স্থায়ী শ্রমিকের চাকরি করতেন কার্ত্তিক পাত্র। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি আরও অনেকের সঙ্গে ত্রিপুরা শরণার্থী শিবিরে গিয়ে ওঠেন। শরণার্থী শিবির থেকে কার্ত্তিক পাত্র আরও ১৮ জনকে নিয়ে আসামের কাছাড় জেলায় চলে যান। ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ছিল। কার্ত্তিক পাত্র অন্যদের সঙ্গে ১ মাস ট্রেনিং নেন। তারপর ওখান থেকে তাঁদের ভারতের জামালপুরে এনে রাখা হয়। ওখান থেকে আসেন রঘুর চর, তারপরে মাছিমপুর। কার্ত্তিক পাত্র অন্য ১৮ জনকে সঙ্গে করে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো আটগ্রাম যুদ্ধ। সিলেটের হরিপুরে ডিসেম্বরের ১৩-১৪ তারিখে এল.এম.জি. হাতে কার্ত্তিক পাত্র যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে কার্ত্তিক পাত্রের সঙ্গী ওই ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ১০ জন শহীদ হন। এঁদের কাউকে ভুলেননি কার্ত্তিক পাত্র।

মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধার কথা বলতে বলতে কার্ত্তিক পাত্র নিজের কথাও বলেন। কমলগঞ্জের মৃত্তিঙ্গা চা বাগানে একটি যুদ্ধের আগে কার্ত্তিক পাত্রের সহযোদ্ধা নন্দলাল গঞ্জু বললেন,'আমি আহত হলে মেরে ফেলবি। তুই আহত হলে আমি শেষ করে দিব।' যুদ্ধের এক পর্যায়ে একটি গুলি এসে কার্ত্তিক পাত্রের বুকের পাশ দিয়ে চলে যায়। কার্ত্তিক পাত্র বলেন, 'নন্দলাল লাগল মনে হয়'। নন্দলাল গঞ্জু বন্দুক ঘুরাতেই কার্ত্তিক পাত্র বললেন,'থাম। আর একটু দেখি।' কার্ত্তিক পাত্রের সরল স্বীকারোক্তি, 'নন্দলাল গঞ্জু বলল, হায় আর একটু হলে শেষ করে দিয়েছিলাম।'

দেশ স্বাধীন হলে অন্যদের মতো কার্ত্তিক পাত্র দেশে ফিরে আসেন। তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হলো সিলেটের জামিয়া স্কুলে। ওখানে ১৫ দিন থাকার পর সকলকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে সময় হলে আবার ডাকবে। সে সময় কার্ত্তিক পাত্রের আরও যারা সহযোদ্ধা ছিলেন, তাঁরা হলেন আলীনগর চা বাগানের গোলাপ বাউড়ি, মনীন্দ্র বাউড়ি, অনিল নায়েক, মুহিত নায়েক, সনাতন চাষা প্রমুখ।

কার্ত্তিক পাত্র মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে বলতে বার বার আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁর মুখেই শুনেছি, মিস্ত্রি লাল নুনিয়া, ইন্দ্রজিৎ নুনিয়া, ললনা নুনিয়া প্রমুখ আলীনগর চা বাগানের বড় লাইনে পাঞ্জাবি ঢুকলে খালি হাতে প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে যায়। ভয়ে পাঞ্জাবিরা গুলি চালালে সকলেই শহীদ হন। তারপর পাক-সেনারাও যথানিয়মে বাড়ি-ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এ খবর অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লে সকলে প্রাণ বাঁচাতে ঘর ছেড়ে পালায়। এসময় পালাতে গিয়ে কেউ কেউ কোলের শিশুটিকে সঙ্গে নেওয়ার কথা ভুলে যায়। অনেক গর্ভবতী পথেই সন্তান প্রসব করে।

মুক্তিযোদ্ধা কার্ত্তিক পাত্র ১৯৬৪ সালে আলীনগর চা বাগানে স্থায়ী শ্রমিকের চাকরি পান। যুদ্ধ ফেরত কার্ত্তিক পাত্র স্বাধীন দেশে সেই শ্রমিকের চাকরি আবার শুরু করেন। তারপর আসে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। অজ্ঞাত কারণে সেদিন গ্রেফতার হন কার্ত্তিক পাত্র। ছয় মাস কারাবাস করেন। তাকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কোনো কিছুই তাঁর কাছে পায়নি। যেদিন মুক্তি পায়, সেদিন রাতে স্থানীয় দারোগা এসে জানিয়ে যায়, 'তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। না হলে বিপদ হবে।' কার্ত্তিক পাত্র তাই করেন। কিছুদিন এখানে ওখানে পালিয়ে থাকার পর ভারতে চলে যান। কার্ত্তিক পাত্র ৮ বছর ভারতে ছিলেন। তারপর যখন ফিরে আসেন, তখন তাঁর স্থায়ী শ্রমিকের চাকরি গেল, বাবাকে হারালেন, একই সঙ্গে বাগানে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও গেল। কার্ত্তিক পাত্র তারপর আলীনগর চা-বাগানে ঠিকা শ্রমিকের চাকরি নেন।

কুমার প্রীতীশ বল

উরাঁও ঐতিহ্যগাথা

উরাঁও ভাষা

চাঁন্দ ও বেলাকের কাথা

চাঁন্দ রাতিঘারি আলো দেওয়েলা আর বেলা দিনঘারি আলো দেওয়েলা। চাঁন্দকের মেলা ছাওয়া হায়। তারা, ধ্রুব (বিনকো) তারা হায়। তেসেন বেলাকেরও অনেক ছাওয়া হায়। বেলাকের রোদ এতেই তাপ যে, চাঁন্দ ও সেখের ছাওয়া মান সহ্যকারে নাই পারায় না। তাখান চাঁন্দ সেখের বাপ মায়কের ঠিনা বুদ্ধি মাংলেই কা কারলে বেলাকের এসেন রোদ সে রেহাই পাওয়াল যাই। তাখান বাপ মায়কের বুদ্ধি সে বেলাকে নেওতা দেলেই। আর বেলাকে খায়লে দেলেই আলু কান্দা সিঝাল।

বেলা আলু কান্দা খায়কে বেশ সাওয়াদ পালেই। সে চান্দ্রকে কাহালেই, ইগুলা কা জিনিস ত্যোয় কনঠিন পালে। তাখান চান্দ কাহালেই হামার ছোটকা ছোটকা ছাওয়াকে সিঝাইকে তোকে খাওয়ালি বেশ সাওয়াদ লাগলেই তাই না? বেলাক ঘারমে যায়কে উকের ছোটকা ছোটকা ছাওয়াকে ডিকচিনে কারকে পানি দেইকে সিঝাই লাগলেই। তাখান সেকের সবছাওয়া মোর গেলেই। ইকের সাঙ্গে সাঙ্গে রাউদ কমে লাগলেই। মরাল ছাওয়া মানকে খায় ল্যাককে আর খায় নাই পারলেই। কারণ, ইহিয়া আলু কান্দা নিয়ার সাওয়াদ নেখেই।

অবশেষে চাঁন্দকের চালাকি বুঝে পারলেই উ সেকে ঠোকায় হায়। বেলা তাখান চাঁন্দকে ধারেক লাগুন কুদায় লাগলেই। এক সময় চাঁন্দকে ধ্যার দেলেই। ঠিক তাখান সে চাঁন্দ গ্রাহান হলেই। কিন্তু বেলা সেকের বাপ মায়কে খোঁজকে নাই পাওয়াথে।

চাঁন্দকের ভিতরে একটা বটগাছ দেখাল গেলেই। মনে হওয়াথে সেকের ভোকরো ভিতরে বুড়হা বুড়হিয়া ডুকগেলা হান। বেলা তাখান টাঙ্গা দেয়কে এক চোপ মারলেই। তাখান চাঁন্দকের গাতারনে আঘাত লাগকে চাঁন্দকের কিছু অংশ গির গেলেই। কিন্তু সেকের পরেও বুড়হা বুড়হিয়াকে বাহারাই নাই পারলেই। আর তাখান সে চাঁন্দ সিরজেলা অর্ধেক বেকা হইকে।

বুড়হা বুড়হিয়া তাখান বেলাকে ভ্যাক দেলান যে, ত্যোয় জেসেন চাঁন্দকে ধারলে চাঁন্দ গ্রাহান হয়েলা ঠিক তেসেন চাঁন্দ গ্রাহানকের মতো তোরহো বেলা গ্রাহান ধারী। অহেনিয়ার তাখান সে চাঁন্দ গ্রাহান ও বেলা গ্রাহান হইকে আওয়াথে।

বৈদ্যনাথ টপ্য

বাংলা ভাষা

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ

চন্দ্র রাতে আলো দেয় আর সূর্য দিনের বেলায় আলো দেয়। চন্দ্রের অনেক বাচ্চা আছে, তারা, ধ্রুবতারা আছে। তেমনি সূর্যেরও অনেক বাচ্চা আছে। সূর্যের তাপ এত প্রখর যে চন্দ্র ও তার বাচ্চারা তা সহ্য করতে পারে না। তখন চন্দ্র তার বাবা-মার কাছে পরামর্শ চাইল কী করে সূর্যের এই প্রখরতা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। চন্দ্র বাবা-মার পরামর্শে সূর্যকে নিমন্ত্রণ দিল। আর সূর্যকে খেতে দিল মিষ্টিআলু সিদ্ধ।

সূর্য মিষ্টিআলু খেয়ে খুব মজা পেল। সে চন্দ্রকে জিজ্ঞেস করল, এগুলো কী? তুমি এ জিনিস কোথায় পেয়েছ? চন্দ্র বলল, আমার ছোট ছোট সন্তানকে সিদ্ধ করে তোমাকে খাওয়ালাম, খেতে কী মজা লাগল তাই না? সূর্য বাড়িতে গিয়ে ওর ছোট ছোট সন্তানকে ডেকচিতে করে পানি দিয়ে সিদ্ধ করতে লাগল। এতে তার সব সন্তান মারা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যের প্রখরতা কমতে লাগল। মৃত সন্তানদের খেতে গিয়ে আর খেতে পারল না। কারণ, তাতে মিষ্টি আলুর মতো স্বাদ নেই।

অবশেষে সূর্য চন্দ্রের চালাকি বুঝতে পারল যে, সে তাকে ঠকিয়েছে। সূর্য তখন চন্দ্রকে ধরার জন্য ছুটতে লাগল। এক পর্যায়ে সে চন্দ্রকে ধরেও ফেলল। ঠিক তখনই চন্দ্রগ্রহণ হলো। কিন্তু সূর্য তার বাবা-মাকে খুঁজে পাচ্ছে না। চন্দ্রের মাঝে একটা বটগাছ দেখে ভাবল এই গুহার ভিতরেই বুঝি বুড়োবুড়ি ঢুকে পড়েছে। সূর্য তখন কুড়াল দিয়ে মারল এক কোপ্, তাতে চন্দ্রের গায়ে আঘাত লেগে চন্দ্রের কিছু অংশ পড়ে গেল। কিন্তু তবুও বুড়োবুড়িকে বের করতে পারল না। আর সেই থেকে চন্দ্রের জন্ম হয় অর্ধেক বাঁকা হয়ে।

বুড়োবুড়ি তখন সূর্যকে অভিশাপ দিল যে, তুমি যেমন চন্দ্রকে ধরলে চন্দ্রগ্রহণ হয়, ঠিক তেমনি চন্দ্রগ্রহণের মতো তোমারও সূর্যগ্রহণ হবে। এভাবেই এখন পর্যন্ত চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়ে আসছে।

নীরেন উরাঁও

পরীক্ষামূলকভাবে গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার **পহর** প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

European Union

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান
(৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭) কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন : ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org